জারিগান ও মনিরুদ্দিন মোড়ল

ড. দেবপ্রসাদ দাঁ*

সারসংক্ষেপ: বাংলা লোকসংগীতে বিভিন্ন ধারা বহমান। এর এক অনন্য ধারা জারিগান। উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে এই গানের সংক্ষেপিত সহ যশোর অঞ্চলের অন্যতম জারি শিল্পী মনিরুদ্দিন মোড়ল সম্পর্কে। বর্তমানে জারিগানের যেসকল উল্লেখযোগ্য প্রবীন শিল্পী রয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম এই শিল্পীর কর্মময় জীবনের পটভূমি উপস্থাপনের সচেষ্ট প্রয়াস সাধিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আরো উপস্থাপিত হয়েছে– জারিগানের উদ্ভব, শিল্পীদের জীবন-জীবিকা, গানের বিষয়বস্তু, জারি ও ধুয়াজারি সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও রয়েছে বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী, গানের আসর বর্ণনা।

জারিগান স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন। মুসলমানদের বীরত্বের ইাতহাসে— মহর্‌রমের করুণ কাহিনী, জঙ্গনামা ও কারবালার গভীর শোকগাথা, শরীয়ত মারফত পৌরাণিক কাহিনী-ই এ গানের মূল উপজীব্য। বিষয়ের নিরিখে এই গান সকল ধর্মাবলম্বীদের নিকট সমভাবে সমাদৃত।

> আরবি 'জারি' শব্দের অর্থ প্রচার। কোনো বিষয় প্রচার বা জাহির করাকে সাধারণত জাহিরী বা জারি বলা হয়। ধর্মীয় বাণী, নীতি-নৈতিকতা প্রচারের জন্য জারি গানের আবির্ভাব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৪৪)

মহর্‌রম মাসের দশম দিনে এই গান পরিবেশনের সাথে সাথে মুসলিম সম্প্রদায় নিজের দেহে ধারালো ছোরা দিয়ে আঘাত করে। খালি পায়ে রাস্তায় হেঁটে মহর্‌রমের কাহিনী বর্ণনা পূর্বক মহর্‌রমের কষ্টকে অনুভব করতে চায় এবং সাধারণ মানুষকে মহর্‌রম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন সনাতন ধর্মের চড়ক পূজা উপলক্ষে সন্যাসীদের কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটা, পিঠে লোহার বড়শি বিঁধে চরকাতে ঝুলে ঘোরা, আগুনের উপর দিয়ে লাফ দেওয়া ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে যেমন মানুষের ধর্ম শিক্ষা ও লোকমানসের বিশ্বাস জাগ্রত করে; তেমনই এ আয়োজন করা হয়ে থাকে ধর্মীয় ও লোক শিক্ষার জন্য। কবি গানের অনুকরণে জারি গান গাওয়া হয়ে থাকে বলেও অনেকে মনে করেন। জারি গান যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে বয়াতি বলে।

কবে থেকে জারিগানের সূচনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু জারি নয়; কোন লোকগানের-ই সূচনা কথা দিন-মাস-সময়ের হিসেবে লিখে রাখা হয় না। কেননা, লোকমানসের ভাবাবেগের এই সোনালী অর্জন আদি থেকে বর্তমানে মিশে আছে। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে জানা যায়, সেকালে আরবের মুসলমানরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন– শিয়া ও সুন্নী। শিয়ারা মনে করতেন রসুলুল্লাহ্‌র জীবনাবসানে তাঁর বংশধরেরা খিলাফতের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবে। অপর দিকে সুন্নীরা মনে করতেন যিনি সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ করতে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পারবেন, ইসলামের জয়পতাকা সারা পৃথিবীতে সবার উপরে তুলে ধরতে পারবেন তিনিই হবেন খলিফা। এ রকম অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব এবং কারবালার হত্যাকাণ্ড।

> কারবালায় শত্রুবেষ্টিত হোসেন ফোরত নদীতে নেমে অঞ্জলিবদ্ধ জল মুখে দিতে গিয়ে জলের অভাবে শত শত শিশুর আর্তনাদ ও সহকর্মীদের শহিদ হওয়ার কথা মনে পড়ায় তিনি জল পান না করে শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করেন। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫০)

এই আত্মত্যাগের কাহিনী মানবতার শিক্ষা দেয়। জারিগানে যখন এই কাহিনী বর্ণিত হয় তখন শ্রোতারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ইমাম হোসেন তাঁদের কাছে হয়ে ওঠেন আদর্শ। কবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) মতে– 'বাংলাদেশে যে এত সহজে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল আর এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছিল তাহা হয়তো এই সব জারিগানের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল।' (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫১) মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের মতে– আঠারো শতকের মধ্যভাগে জারিগান প্রচলিত।

> ড. এস. এম. লুৎফর রহমান মনে করেন যে, পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই জারিগানের উদ্ভব। এবং তা সম্ভব হয়েছিলো গ্রামের আসরে পালাগান, মঙ্গলগান, পাঁচালি গীত হতে দেখে মুসলমান কবিরা এ থেকে জারিগান রচনার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। আর বিষয় হিসেবে সন্নিবেশিত করে থাকবেন কারবালার কাহিনী। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যও তাই-ই মনে করেন। তাঁর মতে– অনুমান হিন্দুর রামায়ণ অথবা চণ্ডী-গীতের পরিবর্তে বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এই জারি প্রচলন করিয়াছিল। প্রচলিত রামায়ণ গান ও চণ্ডী-গীতের সঙ্গে জারি গীতের সাদৃশ্যই ইহার প্রমাণ। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫১)

'জারিগান নিপট ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগীত হয়ে উঠতে অসুবিধে হয়নি।' (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৬৩)

ষড়ঋতুর বাংলায় সব ঋতুতে জারির আসর বসে না। ফলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে স্বশিক্ষিত এই শিল্পীদের কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

> বেশিরভাগ সময় শীত মৌসুমে এ আয়োজন রাত্রে বেশি সংখ্যক লক্ষ্য করা যায়। মূল শিল্পীদের জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্য সামিয়ানার নীচে বসার ব্যবস্থা থাকে। দর্শকরা মঞ্চের চারিদিক গোলাকৃতি হয়ে ঘিরে বসে। অনেক সময় রাত ৮/৯ টা থেকে শুরু হয়ে ফজরের আযান অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলতে দেখা যায়। দুই দলে দু'জন বয়াতি বা মূল গায়েন থাকেন। তাদের প্রত্যেকের সাথে ৯/১০ জন করে দোহার থাকে। (সাক্ষাৎকার: আনোয়ারুল)

এখনো পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সের দর্শকদের নিকট জারি গানের সমধিক প্রাধান্য রয়েছে। পূর্বে জারিগানে ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেলেও আশির দশক থেকে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। একটি জারি গানের বন্দনার কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

ওরে প্রথমে বিসমিল্লা বলে জারি করলাম শুরু
ঐ যে অনাথের নাথ আল্লা দোয়া করবেন গুরু

আহা গুরু কল্পতরু তুই সংসারের সার

এই যে পড়িয়াছি অচল ভরা আমায় কর পার গো

লা ইলাহা ইল্লালা মোহাম্মদ রসুল ॥ (সাক্ষাৎকার: মনিরুদ্দিন)

জারিগানেরও আছে নির্দিষ্ট গীত-পদ্ধতি। প্রথমে এ গানের পদ্ধতি কেমন ছিল তা জানা না গেলেও আদিতে এ গান ধর্ম ভিত্তিক ছিল এ কথা বিভিন্ন ইতিহাস, নথি, পুঁথি ইত্যাদি থেকে দৃষ্ট হয়। যা পরবর্তীতে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হতে শুরু করে। লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার প্রভাবে

> আধুনিককালের পরিবেশনা ও সূচনা পর্বের পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তখনকার গান ছিলো কোরানের আয়াত বা আরবীয় কাহিনী, তাতে থাকতো ধুয়া, আরেব ফেরতা, খুখড়া, বাহির চিতেন প্রভৃতি অংশ। আধুনিক কালে সেসব পরিবর্তিত হয়ে জারিগানের ভাব-ভঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করেছে যাত্রার ভাব। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫২)

বিভিন্ন লোকসংগীতের পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কোন গান কোন গানের প্রভাবজাত তা নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। জারিগান বাংলা লোকগানের তেমনই একটি ধারা। যার সুরের আঙ্গিক, বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাবের অবস্থান কোননা কোন লোকধারার সাথে প্রকরণগত সাদৃশ্যের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রভাবের জাত বিচারে এ গানকে আমরা পাঁচালি ও পালাগানের প্রতিবেশজাত বলতে পারি। প্রকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে কবি ও কীর্তনের সঙ্গে। ব্যবহৃত সুরের আঙ্গিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় রামায়ণ গানের সুর।

জারিগানের বিশেষ একটি অংশ ধুয়া জারি। এ গানের মধ্যে দোহারদের অংশগ্রহণে মূল গায়েনের গাওয়া অংশ ধুয়া ধরে গাওয়াকে অবলম্বন করে উৎপত্তি হয়েছে ধুয়া জারিগানের। এ গানের স্রষ্টা হিসেবে পাগলা কানাই বিশেষ ভাবে খ্যাত। ধুয়া জারি গানেও একইভাবে সমাজের কথা, তথা সাধারণ মানুষের জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে বারংবার। এ গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা ও শিল্পীরা হলেন– সোনাউল্লাহ, মোসলেম উদ্দিন, প্রফুল্ল গোঁসাই, মাছিম মোল্লা, তছির উদ্দিন সমধিক প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত জারি ও ধুয়া জারি গানের শিল্পী মনিরুদ্দিন মোড়ল সাক্ষাৎকালে জানান, "জারিগানের মতো এ গানও একজন বয়াতি উপস্থাপনের সাথে সাথে সকলে তাঁর সুরে ধুয়া ধরে গানের রেশ বৃদ্ধি করে থাকেন এবং সাথে হাত নেড়ে হালকা ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন। এর আঞ্চলিক শব্দ ধুয়োগান।" নিম্নে একটি ধুয়া জারি গানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো—

ওলো ছোট বউলো ছোট বউ তোরে আমি বলি

সব দুঃখ তোর ঘুচে যাবে আমার সাথে গেলি-লো ছোট বউ

কার জন্যে দাঁড়াইছো রাজ পথে?

ছোট বউলো ছোট বউ তোর কপাল দেখি খালি–

সোনার টিকলি গড়ে দেব আমার সাথে গেলি॥(শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ১২৭)

কর্ম সংগীত হিসেবেও এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সর্বসাধারণের কাছে। এমনি ভাবে কর্মের মধ্যে সকলে সমস্বরে ধুয়া ধরে এ গান পরিবেশন করে থাকেন তাদের কর্মের উদ্দীপনার লক্ষে।

> হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল, কাঁসি, বাঁশি, কর্নেট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র জারিগানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে মূল বয়াতি গানের সাথে নিজে একটি কাঠের দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন, যাকে খঞ্জরী বলে। এটি জারিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। দোহারগণ এ গানের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সহযোগীতা করে থাকেন। এছাড়াও দলের চাহিদা-সামর্থ অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে আলাদা যন্ত্রশিল্পী রাখা হয়ে থাকে। (সাক্ষাৎকার: জামিরুল)
>
> জারিগান পরিবেশনের জন্য আসর তৈরি করা হয় চারিধার খোলা উন্মুক্ত মঞ্চে। মঞ্চের চারপাশে শ্রোতারা বেষ্টন করে বসে। রাতের আসর হারিকেন জ্বালিয়ে, সম্ভব হলে হ্যাজাগ লাইট দিয়ে আলোকিত করা হয়ে থাকে। আসর ছোট হলে বাড়ির উঠান কিংবা ধান মাড়াইয়ের খোলেন এবং আসর বড় হলে খেলার মাঠ বা বটতলা ও হাট খোলা বিশেষ স্থানে এ গানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত উন্মুক্ত আকাশের নীচে সামিয়ানা খাটিয়ে উপরে ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রোতাদের বসার জন্য নীচে বেদেপাটি, কোথাও আবার নাড়া, পাটের চট পেতে উপরে কাপড় বিছিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। (সাক্ষাৎকার: মতলেব)

আদিতে এ গান পরিবেশিত হতো মাঠে কর্মসংগীত হিসেবে পরবর্তীতে তা উঠে এসেছে মঞ্চে সাধারণ মানুষের মাঝে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে। এজন্য ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বয়াতি রচনা করেছেন—

আগে জারি ছিল ঘাটে আর মাঠে
এখন সেই সব হয়ে থাকে সুন্দর খাটে॥

গানের কথায় ও সুরে শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠে। গভীর রাত কিংবা সারারাত ধরে গানের আসর চলতে থাকে। মুগ্ধ শ্রোতারা আপ্লুত হয়ে অনেকে শিল্পীদেরকে পুরস্কৃত করেন। বর্তমান সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ গানের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। গ্রামাঞ্চলেও এখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। শ্রোতারা এখন এ ধারার গানের কোন আয়োজন করেনা, যার ফলে শিল্পীরা উৎসাহ হারাতে বসেছে। নতুন করে এ গানের শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে না, কারণ শ্রোতার অভাব। সরকারী ভাবে উদ্যোগী ব্যবস্থাপনা না থাকলে একদিন হয়তো চিরতরে এ গানের বিলুপ্তি ঘটবে।

যশোর অঞ্চলের ধুয়াজারি গানের গায়ক হিসেবে মনিরুদ্দিন মোড়লের নাম বিশেষ উলেখযোগ্য। গায়ক এবং বিচ্ছেদী গান রচয়িতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এবং রচনা শক্তি ছিল আকর্ষণীয়। যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার অন্তর্গত গাঙড়া গ্রাম। মনিরামপুর বাজারের প্রায় ১২ কি:মি: পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই গ্রামে ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট জারি বয়াতি মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল। পিতা- মোঃ রহিম বক্স মোড়ল, মাতা- মুছাঃ আমেনা খাতুন। পেশা- কৃষি। শিক্ষাজীবন শুরু

হয় জালঝাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন মনিরুদ্দিন। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিলো তাঁর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অভাবগ্রস্থ পরিবারের মুখে অন্ন যোগাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাসের পর লেখাপড়ার পাঠ চুকে যায় অতি অল্প বয়সে। ১৯৬৬ সালে যশোর জেলার কোতয়ালী থানাধীন খলসীডাঙ্গা গ্রামের মোঃ জুনাব আলী গাজী এবং খায়রুন্নেছার কন্যা মুছাঃ জোহরা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। স্ত্রী ও সাত সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। সন্তানরা–

ছেলে: ১. মোঃ বাবলু মোড়ল, ২. মোঃ মুকুল মোড়ল, ৩. মোঃ মিলন মোড়ল।

মেয়ে: ১. সখিনা খাতুন, ২. নার্গিস আক্তার, ৩. নূরনাহার, ৪. শামসুরনাহার।

তিনি মানুষকে আর মানুষের কণ্ঠকে ভালবাসতেন। মন ছিল তাঁর সংগীতাসক্ত। সুর ও ছন্দের আবেগে তিনি হয়ে উঠেন ভাবের পাগল, গানের পাগল। ১৮ বছর বয়সে সংগীত জীবনের পথচলা শুরু করেন তিনি। জীবন পথে চার জন গুরুর কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সংগীতের প্রথম হাতে খড়ি ফরিদপুর নিবাসী মোঃ শাহ্জাহান পাটোয়ারীর নিকট। এর পর একে একে শিক্ষাগ্রহণ করেন– ১. মোঃ মুমতাজ আলী গাজী, গ্রাম: হেটোরি, মনিরামপুর; ২. মোঃ আব্দুস সামাদ, ভারত; ৩. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, গ্রাম: দেলোয়াবাড়ি, মনিরামপুর। এঁরা আজ আর কেউ পৃথিবীতে নেই। তবে তাঁদের শিক্ষা আজো রয়ে গেছে মনিরুদ্দিনের মাঝে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সারা পৃথিবী নিমজ্জিত, তাই জারিগানের মতো এমন গ্রাম্য সংগীতের প্রতি অনাগ্রহ থাকায় কোন শিষ্য তৈরি করতে পারেননি তিনি। সন্তানদেরও কারো এই সংগীতের সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

যশোর অঞ্চলে তখন জারিগানের প্রচলন ছিল খুব বেশি। মনিরুদ্দিন আসক্ত হন জারিগানে এবং গাঙড়া গ্রামে একটি জারিগানের দল গঠন করেন। গায়ক ও বয়াতি হিসেবে এ সময় তাঁর সুনাম বেশ ছড়িয়ে পড়ে। আকর্ষণীয় চেহারা ও সুমধুর কণ্ঠ তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস, সুলতান মোল্ল্যা, বিজয় সরকার, অনাদী বৈরাগী, নারায়ণ ফকির প্রমুখ বয়াতির অনেক গান তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁদের গান তিনি বেশী গাইতেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি জারিগান পরিবেশন করেছেন এবং পুরষ্কৃত হয়েছেন অনেক মঞ্চে। উল্লেখযোগ্য– বারান্দী ফকির মেলা, ঝালোকাঠি ফকির মেলা, মনোহরপুর ফকির মেলা প্রভৃতি। শ্রোতাদের চাহিদা মত গেয়েছেন বিভিন্ন জারিপালা তার মধ্যে– নারী-পুরুষ, শরিয়ত-মারফত, হিন্দু-মুসলমান এমন।

জারিপালায় উভয় পক্ষের বয়াতি-ই—

তার শিক্ষা, জ্ঞান, মেধা উপস্থাপন এবং প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা অপরকে পরাজিত করার প্রতিযোগিতায় সবিশেষ চেষ্টা করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ: পুরুষ বনাম নারী বিষয়ক কোনো পালায় পুরুষের পক্ষের বয়াতি হয়তো পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বলতে চাইলেন—

আদির আদিত্যে আদম
সৃষ্টি করেছে দয়াময়
বাপকে ছোট বল কোন কথায়?

এর বিপক্ষ বয়াতি নারীর প্রশংসা সূচক উক্তি করতে গিয়ে হয়তো বললেন —

নারীর বক্ষে আছে সুধা
খেয়ে বাঁচ সব জনা
মাকে কেউ নিন্দা কর না।

এভাবেই পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক, গানের পাশাপাশি ধুয়া, নৃত্য প্রভৃতিও চলতে থাকে এক একটি জারিগানের আসরে। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৪৫)

মনিরুদ্দিনের সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন– ১. মীর আলী (গাঙড়া), ২. আব্দুল হানেফ আলী (বিজয়রামপুর), ৩. আব্দুল সুকুর আলী (সাতগাতি), ৪. জব্বার আলী (শুলাকুড়), ৫. ঢোল বাদক অনিল দেবনাথ (মুজগুণী), ৬. হারমোনিয়াম বাদক মোঃ শামসুর (চালকিডাঙা), এ সকল সহযোগীরা সবাই পরলোকের বাসিন্দা।

যাঁদের সাথে জারিপালা গেয়েছেন– ১. নূর আলী, ২. জায়রা খাতুন, ৩. আবুল কাশেম, ৪. মোঃ সামাদ, ৫. আজগর হোসেন, ৬. ইউসূপ আলী, ৭. বিবি হাসিনা, ৮. নার্গিস।

আসর জমানোর গানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন পালা গানের মধ্যে মাঝে মাঝে ছুটগান হিসেবে আমরা বিচ্ছেদী গান পরিবেশন করতাম। বিশেষ করে– বিজয় সরকার, অনাদী বৈরাগী ও নারায়ণ ফকিরের গান। এছাড়াও অনেক সময় ভাটিয়ালী, মুর্শিদী গানও গাইতে হতো।

মনিরুদ্দিনের নিজের রচিত একটি বিচ্ছেদী গান—

আর কত দিন থাকবিরে মন
পরের বাড়ি, পরের ঘরে।
তোর নাড়ার ছাউনি গেছে উঠে
তাতে ঝরঝরায়ে বৃষ্টি পড়ে ॥
ঘরের বাঁধন-ছাদন হয়েছে ঢিল
নড়ে গেছে তোর দরজার খিল
করতালি দেয় আজরাইল

দিন পঞ্জিকা ধরে।

তোর বিবেক বন্ধু দিচ্ছে সাড়া

খাস জবানে ডাক না তারে ॥

ডুয়া-মাটি তোর নুনা ধরা

রঙ্গিন করছো ঘরের বেড়া

চটাপাতা ধরেছে ঘুণে

ঘরের খুঁটি গেছে নড়ে।

কাল বৈশাখী ঝড় এসে

ভিটে ছাড়া করবে তোরে

পরের বাড়ি পরের ঘরে ॥

মনিরুদ্দি বলে তোরে

সময় থাকতে তল্পি তুলে

গাড়ি আসবার সময় হলো

নাওনারে টিকিট কেটে।

তাই মনের কথা বলবো কারে

সময় থাকতে মন নাও না চিনে

পরের বাড়ি পরের ঘরে ॥

গ্রন্থপঞ্জিঃ

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা– যশোর জেলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৪

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা– নড়াইল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৩

সুরঞ্জন রায়, *মোসলেমউদ্দিন বয়াতির জারি গান লোকধারার পারম্পর্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৩

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল, মনিরামপুর, যশোর

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, ঝিনাইদহ

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ জামিরুল ইসলাম বয়াতী, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, ঝিনাইদহ

সাক্ষাৎকারঃ মতলেব ফকির, কালেক্ট্রি মার্কেট মাঠ, যশোর

টীকাঃ মনিরুদ্দিন মোড়লের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিরিখে।